যুগান্তর

তারিখ ... 03 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

এ কে এম শাহনাওয়াজ

কলেজ শিক্ষার মানে অধঃগতি

ইংরেজ শাসনামলের কথা ছেড়ে দিলাম, পাকিস্তান আমলেও সরকারি কলেজে শিক্ষকতা অনেক সম্মানের ছিল, ছিল আকর্ষণীয়। শুনেছি অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েও কলেজের শিক্ষক হতে বেশি পছন্দ করতেন। সেই সময়ের প্রথিতযশা অনেক শিক্ষকের নাম পাই যারা কলেজে শিক্ষকতা করতেন। কলেজ শিক্ষার মান নিয়েও যথেষ্ট স্বস্তি ছিল। এখন সব যেন আমূল পাল্টে গেছে। সংখ্যা বিচারে দেশজুড়ে অনেক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি কলেজের সংখ্যা অনেক। বেসরকারি কলেজও কম নয়। বেশিরভাগ কলেজের দায়িত্ব ও আভিজাত্য বেড়েছে। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক সম্মান পড়ানো হচ্ছে। কোথাও কোথাও স্নাতকোত্তরও পড়ানো হচ্ছে। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষা ক্যাডারের সম্মান নিয়ে শিক্ষকের সংখ্যা এখন অনেক। কলেজগুলো পরিচালনা বা জাতীয়ভাবে দেখভাল করার জন্য এখন আলাদা করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই এতকিছু হওয়ার পরও সার্বিক বিচারে শিক্ষার মানের সূচক এখন নিম্নমুখী। দেশের উচ্চশিক্ষার মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় অনেক গুণ বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত কলেজগুলোতে। অথচ কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে কলেজগুলোর শিক্ষাদান ও গ্রহণের মান যথেষ্ট শংকিত হওয়ার মতো।

সাধারণভাবে একটি কথা বলা হয়, রাজধানী বা বড় শহরের নামিদামি কয়েকটি কলেজ ছাড়া দেশের অধিকাংশ কলেজে পড়াশোনার ব্যবস্থাপনা খুব দুর্বল। বিশেষ করে বিজ্ঞান অনুষদ ছাড়া অন্যান্য অনুষদে শিক্ষকদের ক্লাস নেয়া যেমন অনিয়মিত তেমনি ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিও নগণ্য। এমনও শোনা যায়, মফস্বল বা দূরবর্তী জেলায় বদলি হওয়া শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করে নেন। পালা করে তারা কলেজে যান। এক একজন শিক্ষকের সপ্তাহে দু'দিন বা তিন দিন গেলেই চলে। অধ্যক্ষ মহোদয়দের সঙ্গে এক ধরনের আপসরফার মধ্য দিয়েই তা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

অভিযোগ আছে, বেশিরভাগ শিক্ষক আজকাল আর নিজেদের তেমনভাবে লেখাপড়ায় যুক্ত রাখেন না। নোট-গাইডের ওপর ভর করে ক্লাসে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রছাত্রীদের বড় অংশ এসব নিয়ে পরোয়া করে না। তাদের ক্লাসে উপস্থিতি নগণ্য থাকে। ক্লাসের চেয়ে সহজে সার্টিফিকেট পাওয়াটা ওদের কাছে মুখ্য এখন। তারা জানে গৎবাঁধা প্রশ্ন আর রেডিমেড গাইড-নোট গলাধঃকরণ করলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বৈতরণী পাড়ি দেয়া কঠিন নয়। আর কলেজের হাতে থাকা ইনকোর্স এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ম্যানেজ করা কোনো ব্যাপার নয়। তাই সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য বছরজুড়ে পড়ার টেবিলে বসা বা লাইব্রেরির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোনো আবশ্যিকতা নেই।

এসব অভিযোগের সত্যতা পেতে খুব খুব কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু তারপরও অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে সত্যের আড়ালে কঠিন সত্য সামনে চলে আসবে। তা হচ্ছে, কলেজ শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাপনায় রয়েছে ভয়ানক বিশৃংখলা আর নৈরাজ্য। এসব সমাধানে দৃষ্টি না দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষকদের ওপর সব দায় চাপালে তা ভীষণ অন্যায় হয়ে যাবে।

সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা অনার্স ও মাস্টার্স পড়ানো কলেজের সংখ্যা ৭০০-এর কাছাকাছি। এছাড়া বিএ (পাস) ডিগ্রি কলেজ আছে হাজারেরও বেশি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী অনার্স খুলতে হলে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে ৭টি পদ থাকতে হবে। আর প্রতি বিষয়ে কমপক্ষে ৩টি পদ না থাকলে বিএ, বিএসএস, বিএসসি ও বিকম চালুর অনুমতি পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধান মতে, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ২টি এবং ডিগ্রি পর্যায়ে ১টিসহ ৩টির বেশি পদ বেতনভুক্ত হওয়ার নিয়ম নেই। এই বাস্তবতায় বেসরকারি কলেজগুলো শর্তসাপেক্ষে বিনা বেতনে অথবা কলেজের ফান্ড থেকে ৩-৫ হাজার টাকা বেতনে শিক্ষক নিয়োগ করে অনার্স বিষয় চালু করে। সুতরাং বোঝাই যায় নিয়মের এই প্যাঁড়াকলে পড়ে মেধাবী শিক্ষকের সংকট রেখেই অনেক কলেজে অনার্স পাঠক্রম চলছে।

সরকারি কলেজগুলোর অধিকাংশেই উচ্চমাধ্যমিক থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত সব শ্রেণীই চালু আছে। বড় কলেজগুলোর কয়েকটিতে প্রতিটি বিষয়ে ১২টি পদ থাকলেও অধিকাংশ কলেজে শিক্ষক পদ ৫ থেকে ৮টির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ কলেজে প্রফেসর পদ শূন্য। তাছাড়া প্রভাষক থেকে সহযোগী অধ্যাপকের দু-একটি পদও বরাবরই শূন্য থাকে। এক্ষেত্রে কলেজগুলোয় বিপুলসংখ্যক ছাত্র ভর্তি করা হয়, অন্যদিকে রয়েছে প্রকট শিক্ষক সংকট। কোনো কোনো শিক্ষকের ওপর ৮-১০টি কোর্স পাঠদানের দায়ভার রয়েছে, যা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে কলেজগুলোর ভৌত অবকাঠামোর বিষয়টি। অধিকাংশ কলেজই প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নেই। অনার্সের প্রতি বিষয়ে প্রতি সেশনে কম-বেশি ৩৫০ জন্য শিক্ষার্থী থাকে। ক্লাসরুম সংকটের কারণে একসঙ্গে বসিয়ে এদের পাঠদান করা কঠিন। যেসব সরকারি কলেজে মাস্টার্স চালু আছে এর প্রায় প্রতি সেশনে, বিশেষ করে কলা অনুষদের বিষয়গুলোয় ছাত্র সংখ্যা প্রতি বিষয়ে ৫০০-এর ওপর। শোনা যায়, কোনো কোনো কলেজে তা হাজারও অতিক্রম করে। অথচ কোনো শিফটিং ব্যবস্থা চালু করারও উপায় নেই।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র সেশন জটের অভিযোগ ছিল। দীর্ঘদিনেও এর সুরাহা না হওয়ায় মন্ত্রণালয় চিন্তা করেছিল আবার সনাতন ধারায় কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। এই প্রস্তাবনা শুনে আতংকিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেশনজট কমানোর জন্য একটি ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করে, যা এখনও অব্যাহত আছে। তা হচ্ছে, পড়ানো হোক বা না হোক, একের পর এক পরীক্ষা নিয়ে সেশনজট কমাতে হবে। ফলে কলেজগুলোয় পরীক্ষার মহোৎসব চলছে। তাই ক্লাসরুম ফাঁকা না পাওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রুটিন মাফিক ক্লাস নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অর্থাৎ নানাভাবেই স্বাভাবিক বিদ্যাচর্চা ব্যাহত হচ্ছে।

গোদের ওপর বিষফোঁড়া আরও আছে। অধিকাংশ কলেজেই শিক্ষকদের পাঠদান ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের ফরম ফিলাপ, ভর্তিসংক্রান্ত অনেক করণিক কাজ করতে হয়। যা তাদের শিক্ষকের সাধারণ দায়িত্ব পালনকে সমস্যায় ফেলে।

এ সময়ে চলমান আরেকটি জরুরি সংকটের কথা না বললেই নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে বিশেষজ্ঞরা প্রায়োগিক ক্ষেত্রের বাস্তবতা বিবেচনা না করে প্রায় বছরই নিরীক্ষা চালাচ্ছেন সিলেবাস নিয়ে। তারা প্রায় বছরই অনার্সের সিলেবাস পরিবর্তন করছেন। একে বিশেষ নবায়ন বলব কিনা জানি না। তাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পড়ছেন মহাসংকটে। এতে করে একজন শিক্ষক দীর্ঘদিন একটি নির্দিষ্ট বিষয় পড়ানোর দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারেন না, অন্যদিকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী পড়ে বই সংকটে। কারণ চাপিয়ে দেয়া সিলেবাসের বই হয়তো লেখাই হয়নি। বা সিলেবাসকে মোকাবেলার জন্য বই বাজারে সহজলভ্য নয়। এ নিয়ে নানা মুখরোচক কথা প্রচলিত আছে। যেমন কলেজ পর্যায়ের বাজার বড়, তাই বইবিহীন সিলেবাস চাপিয়ে দিয়ে গাইড প্রকাশকদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। কয়েক বছর আগে একটি নতুন সিলেবাস আরোপিত হয়। বাধ্যতামূলক করা হয় বিভাগ নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থীর জন্য। ফলে লাখ লাখ কপি বই বিক্রির সুযোগ তৈরি হয়। বলা হয়, সিলেবাস প্রণেতা কোনো প্রভাবশালী চক্র নাকি সিলেবাস প্রকাশ না করে আগে সিলেবাসের আলোকে তাড়াহুড়ো করে দুর্বল মানের বই লিখে, মুদ্রণ করে বাজারে ছেড়ে তারপর সিলেবাস পাস করিয়ে নেয়।, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তা আবশ্যিক পাঠ্য করে দেয়।

প্রসঙ্গক্রমে একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অরাজকতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অনার্সে কোর্স পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। এতে রয়েছে ১৫ নম্বরের একটি 'ইনকোর্স' পরীক্ষা। ক্লাসে ছাত্র উপস্থিতির ৫ নম্বরসহ মোট ২০ নম্বর দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে শিক্ষকের হাতে। অভিযোগ রয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নম্বর প্রদান ন্যায়ানুগভাবে হয় না। সবচেয়ে অস্বচ্ছতা তৈরি হয় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর প্রদানে। অনার্স, মাস্টার্স ও প্রিভিয়াসে মৌখিক পরীক্ষায় ৫০ নম্বর রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাচিত বহিস্থ শিক্ষকসহ কলেজের একটি পরীক্ষা কমিটি পরীক্ষা নিয়ে থাকে। এই পরীক্ষায় নম্বর প্রদানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি ও প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনের নেতাদের প্রভাব থাকে। এই প্রভাব পরীক্ষা কমিটি প্রায়ই এড়াতে পারে না। তাই বোর্ডের সামনে কিছু বলতে পারুক বা না পারুক, অধিকাংশ পরীক্ষার্থীকে ৫০-এর কাছাকাছি নম্বর দিতেই হয়।

এ ধরনের নানা সংকটের বেড়াজালে আমাদের কলেজ শিক্ষা দেশের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশীকে সার্টিফিকেটের জোগান দিচ্ছে।

প্রতি বছর যারা পাস করছে তাদের একটি ছোট অংশ ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও যোগ্যতায় নিজেকে তৈরি করছে। বাকিদের অবস্থা প্রকৃত অর্থে সার্টিফিকেটনির্ভর। দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এমন দুর্বলতার মধ্যে বেড়ে উঠলে তা দেশের ভবিষ্যৎকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে। অথচ এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যেসব নীতিনির্ধারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করা উচিত, সেখানে একটি নির্লিপ্ততা কাজ করছে। কলেজ শিক্ষকদের শিক্ষাদানের অনুকূলে যৌক্তিক সুযোগ দেয়ার পর তাদের কাছ থেকে দায়িত্ব পালনে জবাবদিহিতা আদায় করে নিতে হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের। প্রয়োজনে শিক্ষকদেরও আত্মশুদ্ধ হতে হবে। পাঠদান, চর্চা ও গবেষণায় তারা কতটা নিবেদিত সেই প্রশ্নের উত্তর নিজেদের কাছ থেকেই আদায় করতে হবে। সুশিক্ষিত প্রজন্ম না পেলে জাতির এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রতিদিন বন্ধুর হবে।

প্রতি বছর যারা পাস করছে তাদের একটি ছোট অংশ ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও যোগ্যতায় নিজেকে তৈরি করছে। বাকিদের অবস্থা প্রকৃত অর্থে সার্টিফিকেটনির্ভর। দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এমন দুর্বলতার মধ্যে বেড়ে উঠলে তা দেশের ভবিষ্যৎকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে। অথচ এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যেসব নীতিনির্ধারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করা উচিত, সেখানে একটি নির্লিপ্ততা কাজ করছে। কলেজ শিক্ষকদের শিক্ষাদানের অনুকূলে যৌক্তিক সুযোগ দেয়ার পর তাদের কাছ থেকে দায়িত্ব পালনে জবাবদিহিতা আদায় করে নিতে হবে।

একেএম শাহনাওয়াজ : *অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
shahnawaz7b@gmail.com